অদ্বৈত মল্লবর্মণের ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ভাষা

সোহানা মাহবুব*

সাতচল্লিশ-পূর্ব বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ এক অনন্য নাম। স্বল্পপ্রজ এই লেখক উপন্যাসের বাইরে মাত্র চারটি ছোটগল্প লিখেছেন। ব্যক্তির অন্তর্জীবনের স্বরূপ উন্মোচনই ছিল তাঁর গল্পের মৌল অভিপ্রায়, যা অদ্বৈত মল্লবর্মণকে গভীরভাবে করে তুলেছে অন্তর্বাস্তবতার শিল্পী। চরিত্রের গভীরে সন্ধানী আলো ফেলে এই লেখক তাঁর গল্পে তুলে এনেছেন ব্যক্তির ভাবনা-বেদনা। ব্যক্তিসত্তার বহির্বাস্তবতা নির্মাণের পাশাপাশি ক্রমরূপান্তরশীল অন্তর্বাস্তবতার স্বরূপ অঙ্কনে সচেষ্ট অদ্বৈত তাঁর গল্পের ভাষাকে স্বাভাবিকভাবেই করে তুলেছেন ব্যঞ্জনাময় এবং প্রতীকধর্মী। চারটি গল্পের বিষয় বিশ্লেষণে অদ্বৈত-র ভাষাব্যবহার প্রবণতা উপলব্ধি করা যাবে। তাঁর প্রথম গল্প 'সন্তানিকা'য় এক সর্বহারা নিঃস্ব বৃদ্ধের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য, তার অস্তিত্বভাবনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, পারিবারিক আবহের উষ্ণ সাহচর্যে মৃত্যুবরণের দুর্মর আকাঙ্ক্ষা এবং মৃত্যুকেন্দ্রিক প্রগাঢ় নৈঃসঙ্গ্যচেতনা রূপায়ণে অদ্বৈত মল্লবর্মণ যথাযথ ভাষা ব্যবহারে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শুধু 'সন্তানিকা' নয়, 'কান্না' গল্পেও গুরুদয়াল নামক এক বিপত্নীক ভবঘুরে ব্যক্তিসত্তার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা রূপায়ণে অদ্বৈত ভাষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। একইরকমভাবে, 'বন্দী বিহঙ্গ' গল্পে কলকাতার যান্ত্রিক জীবনে বন্দী এক বিহঙ্গের মতোই সাপ্তাহিক খবরের কাগজের নিতান্তই ছাপোষা সহকারী সম্পাদক আবু মিয়ার মুক্ত প্রকৃতি আর পরিজনের সান্নিধ্যলাভের ব্যাকুলতা গীতল ভাষায় প্রতিভাসিত। এ তিনটি গল্প ছাড়াও 'স্পর্শদোষ' গল্পের ব্রাত্যমানুষ ভজা আর পথের খেঁকী, নেড়ী কুকুরের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের আপাত দ্বন্দ্ব এবং গল্পশেষে ভজার প্রগাঢ় মানবিক আলিঙ্গনে মৃত নেড়ীর সঙ্গে সেই বিরোধের করুণ নিষ্পত্তি অঙ্কনে অদ্বৈত মল্লবর্মণ যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, নিঃসন্দেহে তা নান্দনিক। অদ্বৈত-র এই নান্দনিক ভাষারীতির শিল্পরূপ বিশ্লেষণই বর্তমান প্রবন্ধের মূল উপজীব্য।

প্রাক-সাতচল্লিশ ছোটগল্পের ধারায় যাঁরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), মাহবুবুল আলম (১৮৯৮-১৯৮১), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১), আবু রুশদ (১৯১৯) এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। চল্লিশের ও পঞ্চাশের দশকের এসব গল্পকারের প্রবণতা ও অন্বিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে আহমদ কবির লিখেছেন :

> বাংলা গল্পে সমাজ চেতনা, মানবতা এমনকি সমাজতান্ত্রিক আদর্শও নতুন বিষয় নয়, কিন্তু একটি জনগোষ্ঠীর জীবনের সঙ্গে সেগুলো কিভাবে মেলানো যায় কিংবা কিভাবে সেই জীবনকে এবং জীবনের সত্যকে তুলে ধরা যায়, তা-ই দেখার বিষয়। উল্লিখিত গল্পকারদের সম্পর্কে একথা সত্য যে, তাঁরা ছিলেন প্রবলভাবে জীবনবাদী ও সমাজসংলগ্ন। তাঁদের গল্পের

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

> বিষয়ে যেমন দেশ বিভাগ পূর্বকালের জীবনচিত্র রূপায়িত তেমনি আছে বিভাগ পরবর্তীকালের। উদ্বাস্তু সমস্যা, মন্বন্তর, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, দাঙ্গা ইত্যাদি নিয়ে তাঁরা গল্প লিখেছেন। তবে প্রাধান্য পেয়েছে বাংলাদেশের গ্রাম্যজীবন। গ্রামের বা শহরের যে ধরনের বিষয় তখনকার গল্পকাররা অবলম্বন করুক না কেন, গল্পে যাপিত জীবনের সংকট ও সমস্যার আলেখ্যই তাঁরা রচনা করেছেন। (কবির, ২০০১ : ২৬৫-৬৬)

অদ্বৈত মল্লবর্মণের ছোটগল্প উপর্যুক্ত প্রবণতার আংশিক ধারক। কেননা তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তির অনুভূতি, মানবীয় জীবনসত্য, আবেগীজীবন, বেদনার্ত সত্তার আততি রূপ পেয়েছে তাঁর গল্পে; আর ব্যক্তির মানস-প্রবণতার এসব নানা প্রান্ত বিশ্লেষণে অদ্বৈত তাঁর গল্পে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, সেটি অনুভববেদ্য, ইঙ্গিতময় এবং বিষয় ও ভাব বিশ্লেষণের উপযোগী এবং 'পরিচর্যারীতিতে ... পুরোপুরি বর্ণনা-নির্ভর। বস্তুত অদ্বৈত-র গল্পভাবনা এবং প্রকরণজিজ্ঞাসা তাঁর নিরেট গদ্যময় সহজাত জীবন চেতনারই প্রতিবিম্ব। ... সহজ কাব্যময় বর্ণনার মধ্য দিয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণ জীবনের যে রূপ প্রস্ফুট করেছেন, সে জীবন অনুভূতিময়' (খান, ২০০৭ : ৪১২)। অদ্বৈত'র ভাষাভঙ্গি এই 'অনুভূতিময়'-সকরুণ জীবন-কথারই স্বরূপ-নির্মাণে সহায়ক।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর ছোটগল্পে সাধু ও চলিত এই দুই রীতির ভাষাই ব্যবহার করেছেন। 'সন্তানিকা' গল্পের পুরো বর্ণনায় সাধুভাষারীতি ব্যবহৃত হলেও সংলাপে ব্যবহৃত হয়েছে চলিতভাষারীতি। একই ভাষা কাঠামো ব্যবহৃত হয়েছে 'কান্না' গল্পেও। অন্যদিকে সংলাপ ও বর্ণনাভঙ্গি — উভয়ক্ষেত্রেই চলিতরীতি ব্যবহৃত হয়েছে 'বন্দী বিহঙ্গ' গল্পে। সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত 'স্পর্শদোষ' গল্পে বিষয়ের ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখতে সচেষ্ট লেখক সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন। তবে জীবনরীতি সম্পর্কিত ভাবচিন্তা রূপায়ণে ব্যবহৃত এই ভাষার প্রবল বর্ণনাধর্মিতা গল্পের বাস্তবনিষ্ঠাকে অনেকাংশে ক্ষুণ্ন করেছে। মূলত, কথাসাহিত্যে ভাষা হল 'বাস্তব জীবনের অভিপ্রকাশ (ম্যানিফেসটেশন) মাত্র' (Marx and Engels, 1958 : 432 and 30, উদ্ধৃত : পবিত্র সরকার)। এক্ষেত্রে কাহিনির বস্তুনিষ্ঠা রক্ষায় বর্ণনাধর্মিতার পরিবর্তে সংলাপের ওপরেই জোর দেয়া হয় বেশি। কারণ, চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সংলাপ জীবনবাস্তবতার নির্জলা রূপ অঙ্কনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু, অদ্বৈত-র চারটি ছোটগল্পেই সংলাপের পরিবর্তে বর্ণনার প্রাবল্যই চোখে পড়ে।

ছোট ছোট বাক্যের ব্যবহার অদ্বৈত'র ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'সন্তানিকা' গল্পে খুব দীর্ঘ বাক্য ব্যবহৃত হয়নি। তবে দু-একটি ক্ষেত্রে দীর্ঘ বাক্যও চোখে পড়ে। 'কান্না' গল্পে এমন একটি বাক্যের উদাহরণ :

> ছিরিক্ষেত্র বিন্দেবনের কথা বলিতে বলিতে অবশেষে এমনি একটা কথা তার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল যে, যারা শুনিল, চোখ দুইটি ছানাবড়ার মতো করিয়া হাঁ করিয়া তার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ১১)

খণ্ড বাক্যের শেষে কয়েকটি অসমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত করে এই দীর্ঘ বাক্যটি গঠিত। যদিও এমন বাক্য অদ্বৈত-র ছোটগল্পে খুব বেশি পাওয়া যাবে না।

শব্দ ব্যবহারে অদ্বৈত তৎসম শব্দের পাশাপাশি লোকশব্দের মিথস্ক্রিয়া ঘটিয়েছেন। বিষয় অনুযায়ী তাঁর ছোটগল্পে শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ 'সন্তানিকা' গল্পে

বৃদ্ধ ধনঞ্জয়ের মাস্টারিসুলভ বাক্য ব্যবহারে তিনি তৎসম শব্দকে অনিবার্য করে তোলেন। কয়েকটি উদাহরণ :

ক. বিকৃত মুখের তর্জন-গর্জন, প্রহারোদ্যত হস্তের তাড়না, যুদ্ধং দেহি অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি সকল মিলিয়া তাহাকে ক্ষিপ্তের ন্যায় করিয়া তোলে। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ৬)

খ. এইবার এই সূক্ষ্মদর্শী বালকটির প্রতি স্নেহে বুড়ার প্রাণ মন আপ্লুত হইয়া উঠে। প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়া তাহার সমস্ত বালাই টানিয়া আনিতে চায়! মুহূর্তে তাহাকে চিরঞ্জীব করিয়া তুলিতে চায়। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ৬)

গ. গিন্নীমার মুখখানাও বেদনা ও করুণায় এমন আকার ধারণ করিয়াছে — যেন বিশ্বের চিরন্তন মাতৃমূর্তি অজস্র স্নেহ বক্ষে লইয়া তৃষিত সন্তানকে অভয় দিতেছে। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ৯)

উপর্যুক্ত বাক্যগুলোতে তৎসম শব্দের প্রাবল্য থাকলেও 'বালাই' কিম্বা 'তাড়না'র মতো লোকজ শব্দ ব্যবহার গল্পের ভাষাকে দিয়েছে চলিত রীতির গতিশীলতা। 'স্পর্শদোষ' গল্পেও তৎসম শব্দের অনায়াস ব্যবহার লক্ষণীয় :

> ভজা কোমর গোড়ালি পর্যন্ত নত করিয়া কনুই পর্যন্ত হাত দুইটি ভূমিতলে স্থাপন করিল। তারপর খেঁকীর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া থুতনি বাড়াইয়া বিকট এক শব্দ করিয়া উঠিল। খেঁকী উহার মধ্যে নিজের স্বরূপ দেখিয়া পিছাইয়া গেল। কিন্তু ভজার পশ্চাতের দিকে ঘুরিয়া গিয়া আবার আক্রমণোদ্যত হইল। ভজা তাহার দিকে ঘুরিয়া গিয়া আবার পূর্বকার্যের অনুকরণ করিল। খেঁকী রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ২১)

উপর্যুক্ত উক্তিতে অদ্বৈত-র ভাষা চিত্ররূপময়। ভজার দেহভঙ্গির ক্রমরূপান্তর শব্দপ্রয়োগের নৈপুণ্যে চিত্রল হয়ে উঠেছে। যদিও প্রায় প্রতিটি বাক্যের শেষে 'ইল' প্রত্যয়ের ব্যবহার এই বর্ণনাকে অনেকটা একঘেয়ে করে তুলেছে এবং তৎসম শব্দ ব্যবহারের প্রাবল্যে এটি খেঁকী ও ভজার ব্রাত্য অস্তিত্ব ও প্রান্তিক অবস্থান বর্ণনার যথাযথ ভাষা হয়ে ওঠেনি, তবু গল্পের রসপরিণাম বিচারে খেঁকীর অপঘাত মৃত্যু এবং ভজার সহানুভূতিশীল বেদনার্ত সত্তার আবেগঘন আবহ সৃজনে এই ভাবগম্ভীর সাধুভাষারীতি শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি।

শুধু 'সন্তানিকা' বা 'স্পর্শদোষ' গল্পেই নয়, 'কান্না' গল্পেও দুই নারীর সৌন্দর্য বর্ণনায় লেখক তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন :

> একখানা কলমুখর অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত মুখ আর একখানা নির্বাক শ্রীহীন বেদনাময় মলিন মুখ।
> ... দুঃখদগ্ধ রূপহীন মুখখানার দিকে চাহিয়া কেবল ভাবিতেই লাগিল। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ১৪)

উপর্যুক্ত বাক্যগুলোতে স্বল্প কিছু তৎসম শব্দের ব্যবহারে অদ্বৈত এই দুই নারীর রূপই শুধু বর্ণনা করেননি, চিহ্নিত করে দিয়েছেন তাদের মধ্যেকার অস্তিত্বের ব্যবধানগত স্বরূপটিকেও।

শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অদ্বৈত মল্লবর্মণ কোথাও কোথাও অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ভাগ্যের নির্মমতায় মর্মাহত গুরুদয়াল বেদনার্ত সত্তা নিয়ে কান্নার পরিবর্তে

'উৎকট আনন্দে' হেসে ওঠে। আনন্দের সঙ্গে উৎকট শব্দটি ব্যবহার করে অদ্বৈত এ আনন্দের অদ্ভুত-অনাবশ্যক বেদনাকেই প্রতীকায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, এ হাসি শ্মশানবাসীদের মতো প্রাণহীন-অদ্ভুতুড়ে। এছাড়া তাঁর ভাষায় লক্ষণীয় চমৎকার অভিনব সব বিশেষণের ব্যবহার :

ক. নিঃশঙ্ক বেপরোয়া মন

খ. স্বল্পজীবী সময়

গ. মন বড় ঘাতসহ

ঘ. কচিগুড়ো (সন্তান সম্বন্ধে ব্যবহৃত)।

বিশেষণগুলো সুপ্রযুক্ত সন্দেহ নেই। এর দ্বিতীয়টিতে সময়ের বিশেষণ হিসেবে 'স্বল্পজীবী' শব্দ ব্যবহার করে লেখক সময়কে সজীব করে তুলেছেন। ফলে এখানে সমাসোক্তি অলংকারে আবহ সৃষ্টি হয়েছে।

অদ্বৈত-র গল্পের বাক্য বিশ্লেষণ করলে নানা প্রান্তিকতা উন্মোচিত হবে। এর একটি হল ভাষায় ডিটেইলের ব্যবহার। অনুপুঙ্খভাবে চরিত্র রূপায়ণের জন্যই তাঁর ভাষায় এই প্রবণতা লক্ষণীয়। পাঠক যেন চরিত্রকে চোখের সামনে হেঁটে বেড়াতে দেখেন। 'সন্তানিকা' গল্পের বৃদ্ধ মাস্টার দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত ও অবহেলিত। তার অনুপুঙ্খ মানসিক ও শারীরিক বর্ণনা পাঠকের কাছে তাকে সজীব ও মূর্ত করে তোলে :

> বুড়ার বয়স হইয়াছে নেহাত কম নয়। হাঁটু পর্যন্ত পরতে পরতে ধুলা লাগিয়াছে — যেন মোজা পরিয়াছে! বহুদূর হইতেই হাঁটিয়া আসিতেছে হয়তো। গায়ে একটা ছেঁড়া জামা বাম কক্ষে একটা শত মলিন কাপড়ের পুঁটলি। শত তালি দেওয়া চটি জোড়াটা সে বাম হাতে রাখিয়াছে। ডানহাতে একটা পুরনো ছাতা আর একটি বাঁকা লাঠি। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ৩)

উপর্যুক্ত বর্ণনায় প্রকট হয়ে উঠেছে বৃদ্ধ মাস্টারের দারিদ্র্য। লেখক যেখানে লিখছেন 'কোথা হইতে কেমন করিয়া সে জীবনের এই শেষের পথে আসিয়া পড়িয়াছে সে ইতিহাস একমাত্র সে-ই জানে। দুনিয়ায় আর কে কে জানে জানি না —' সেখানে এই বৃদ্ধের অস্তিত্বসংকটই প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে। শেকড়হীন অনিকেত এই মানুষটিকে জীবনের সমস্ত ভার একাই বয়ে বেড়াতে হয়েছে — এই অস্তিত্বহীনতার ভাষিক রূপায়ণে অদ্বৈত সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। শুধু এই বৃদ্ধই নয়, শহুরে জীবনপটে মূলীভূত হতে ব্যর্থ 'বন্দী বিহঙ্গ' গল্পের সহকারী সম্পাদক আবু মিয়াও এই নিরস্তিত্বের যন্ত্রণা বহন করেছে। তবে 'সন্তানিকা' গল্পে বৃদ্ধের অস্তিত্বহীনতা ভাষিক রূপ পেয়েছে ভাবালুতাহীন বাস্তবঘন বর্ণনায়, অন্যদিকে 'বন্দী বিহঙ্গের' ভাষা প্রায় গীতল। 'বন্দী বিহঙ্গ' গল্পের একটি দৃষ্টান্ত :

> আবু মিয়ার মন একবার অনেক দূরের সেই পশুপতিপুরের গ্রামের ছায়া-ঘেরা পুকুরের পাড়, কয়েকটি পরিচিত পেয়ারা গাছের তলা — এসব ঘুরে এসে ডেস্কের উপর অবস্থিত হয়। ... বুকটা খচখচ করে। হাতের কলম স্তব্ধ হয়ে যায়। চিবুকে দুখানা হাতের চেটু রেখে আবু মিয়া কোনো একদিকে চোখ মেলে দেয়। চারদিকে পাকা দেওয়াল। ... বিশেষ কিছু দেখাও যায় না। দেখা যায় কেবল পাশের জুবেনাইল জেলের উঁচু পাঁচিল। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ১৮)

কংক্রিটসদৃশ কলকাতার এই নিরেট যান্ত্রিক জীবনের সঙ্গে জুবেনাইল জেল-অনুষঙ্গ যুক্ত করে লেখক আবু মিয়ার বন্দি জীবনকেই যেন প্রতীকায়িত করেদেন। সেই সঙ্গে এই জীবনে আবুর মূলীভূত হতে না পারার বেদনাও গল্পে গীতল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

অদ্বৈত-র ভাষার অন্য একটি বিশেষত্ব হল অসম্পূর্ণ বাক্য-ব্যবহার। 'কান্না' গল্পে এর প্রাবল্য লক্ষ করা যাবে। অনেকক্ষেত্রে টেনশন ঘনীভূত করার জন্য বাক্যের শব্দ উহ্য রেখে পাঠককে গল্পকাহিনিতে যুক্ত করার আকাঙ্ক্ষায় লেখক এ প্রবণতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কোনো কোনো অন্তর্মুখী চরিত্রের স্বভাবস্বর নির্মাণেও অসম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার গল্পে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। কয়েকটি উদাহরণ :

ক. যার ঘরে শান্তি নেই তার বাইরেও অন্ধকার! কথায় বলে লক্ষ্মীছাড়া ... (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ১০)

খ. কেমন মানুষ সে, তা আমার ভালো মতোই জানা আছে। পড়ত আমার হাতে, ঝেঁটিয়ে— (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ১১)

গ. কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আহ্লাদী বলিল, আমাকে তুমি ক্ষমা করলে! কিন্তু আমার তো দোষ নেই, আমার কি মনের সাধ যে একটা বুড়োর সঙ্গে ... (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ১৩)

ঘ. এখনও তো সময় আছে। বিয়ের তো আরও দু'দিন বাকি। তুমি যদি অমত না হও ... (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ১৩)

অসম্পূর্ণ এই বাক্যগুলোতে কখনও অব্যক্ত ক্ষোভ-বেদনা আবার কখনো অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা অনুরণিত হয়। লেখক সবটুকু প্রকাশ না করে কিছু অংশ উহ্য রাখলেও পাঠক গল্পের চরিত্রগুলোর আবেগের সঙ্গে নিজেকে একাকার করে নিয়ে হয়ে ওঠে গল্পের অনিবার্য অংশ। শুধু এই বাক্যগুলোতেই নয়, গুরুদয়ালের চিন্তনস্রোতেও অসম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। চিন্তনস্রোতের গতি কখনও অতীতচারী, কখনও বর্তমানে স্থিত আবার কখনও ভবিষ্যৎমুখী। অর্থাৎ চেতনার গতি কখনই একটানা একটি কাল-অবলম্বী নয়। এ কারণেই আহ্লাদীর সঙ্গে পুনর্বিবাহের ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকু বিলীন হওয়ার পরও গুরুদয়ালের বেদনার্ত ও ঈর্ষাকাতর চেতনা দ্বিধাহীন চিত্তে আহ্লাদীর সঙ্গে অন্যপুরুষের আসন্ন পরিণয়ের বিবাহমণ্ডপে বিচরণ করে ফেরে। তার সেই কাল্পনিক বিচরণশীল চিন্তনস্রোতের ভাষিক রূপায়ণে পাঠক খণ্ড বাক্য ব্যবহৃত হতে দেখেন। চরিত্রটির হোঁচট খাওয়া ঈর্ষান্বিত সত্তার অব্যক্ত যন্ত্রণা বাক্যগুলোতে বিধৃত :

> এতক্ষণে হয়তো সেই বুড়া বরটা সদলবলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ... তারপর, বিবাহের লগ্ন উপস্থিত। বরকর্তা বলে, মেয়ে বার কর ... নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া আহ্লাদীকে বাহিরে আনিল। সে হয়তো আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু লোকেরা তাহা শুনিবে কেন? তারপর — বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এখন হয়তো — ফুলশয্যায়। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ১৪)

গুরুদয়ালের চিন্তাকে উপর্যুক্ত স্তবকে মূর্ত করে তোলা হয়েছে। শুধু তাই নয় এ স্তবকের শেষ বাক্যটিতে ব্যবহৃত হয়েছে 'ড্যাস' চিহ্ন; আকাঙ্ক্ষিত প্রণয়িনীর অন্য পুরুষের সঙ্গে বিয়ের বিষয়টি সত্তায় ধারণ করতে গুরুদয়ালের যে সময়টুকু প্রয়োজন ছিল, লেখক যেন সেই সময়টুকু ক্ষেপণ করেছেন 'ড্যাস' চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে। বিরাম চিহ্নের এই ব্যবহার-দক্ষতা অদ্বৈত-র গল্পভাষাকে ঋদ্ধ করেছে।

বাক্যগর্ভে নিহিত ব্যঞ্জনার প্রতীকী উদ্ভাসন অদ্বৈত-র গল্পভাষার আরেক বিশিষ্ট পরিচয়। 'সন্তানিকা' গল্পে গিন্নিমার ছোটবোনের আগমনে বৃদ্ধের চিত্ত এই পরিবারের সঙ্গে একাত্মতার আকাঙ্ক্ষায় পুলকিত হয়ে ওঠে। তার সত্তা নিরস্তিত্বের যন্ত্রণা ভুলে নতুন এক পরিচয়ে শেকড়ায়িত হতে চায়। প্রতীকী পরিচর্যায় লেখক ভাষাকে দ্যোতনাময় করে তুলেছেন :

ক. উৎসবের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া এই স্থবিরত্বের বদ্ধজলাটায় নতুন স্রোত বহাইতে চায়। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ৮)
খ. হালশূন্য জীবনের তরণীটা যদি ভাসিতে ভাসিতে আশাতীতের মত এখানে আসিয়া ঠেকিয়াছে, একটা কিনারা সে পাইয়াছে। এই কূল হইতে তাহার ডুবো-ডুবো তরীটাকে ভাসাইয়া দিলে সে আর কূল পাইবে কি না কে বলিবে। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ৭)

উদ্ধৃতি ক-তে বার্ধক্যের ভারগ্রস্ততায় স্থবির ধনঞ্জয়ের নিস্তরঙ্গ জীবনকে লেখক 'বদ্ধজলা'র প্রতীকে চিহ্নিত করেছেন। বদ্ধজলার নতুন স্রোত হল বীরেশবাবুর পরিবারের স্নেহের বন্ধন। অন্যদিকে উদ্ধৃতি খ-তে 'হালশূন্য জীবনের তরণী'রূপে এই বৃদ্ধের স্বজনহীন, নিরস্তিত্বের যন্ত্রণায় হাহাকারময় জীবনবেদনাই প্রতীকায়িত হয়েছে। দুটি উদাহরণই ব্যঞ্জনাময় প্রতীকী শব্দ ব্যবহারে ঋদ্ধ।

'সন্তানিকা' গল্পের মতো 'কান্না' গল্পেও মেলে ব্যঞ্জনাবাহী বাক্যের ব্যবহার। গুরুদয়ালের সঙ্গে আহ্লাদীর বিয়ে ভেঙে যাবার পর তিতাস নদী পেরুনো গুরুদয়ালের লঞ্চে আহ্লাদীকে দেখার প্রতিক্রিয়া এবং হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা গল্পে প্রতীকী পরিচর্যা পেয়েছে। লেখকের ভাষা ব্যবহার এখানে অসাধারণ :

লঞ্চে উঠিয়াই যাহা দেখিল, অবাক না হইয়া পারিল না। যাহার সহিত পূর্বে তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল সেই বিধবা তরুণী। গুরুদয়ালের বুকটা হঠাৎ মোচড় দিয়া উঠিল। তিতাস নদীর ঢেউগুলিকে দুইধারে ভাগ করিতে করিতে দ্রুতগতিতে মোটর-লঞ্চ চলিয়াছে। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ১৩)

এখানে 'তিতাস' যেন গুরুদয়ালের সত্তারই নামান্তর, যে সত্তা আহ্লাদীকে লঞ্চে দেখার পর লঞ্চের আঘাতে তিতাসের জলের মতোই বেদনায় দ্বিখণ্ডিত। আহ্লাদীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে লেখক গুরুদয়ালের মনোভঙ্গির ভাষিক রূপায়ণে যে শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেটি তাদের দুজনের মধ্যেকার বর্তমান সম্পর্কের নেতিবাচকতাকেই ধারণ করেছে প্রগাঢ়ভাবে :

... গুরুদয়াল লঞ্চ হইতে নামিয়া পড়িতে পারিলে যেন রক্ষা পাইত। বুঝি সাপ দেখিয়াছে, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। ... একটা শীতল স্পর্শ অনুভব কনিয়া গুরুদয়াল চমকাইয়া চাহিয়া দেখে আহ্লাদী তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ১৩)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে ব্যবহৃত 'সর্প' ও 'শীতলতা' শব্দ দুটো গুরুদয়াল ও আহ্লাদীর সম্পর্কের বৈরিতা ও নেতিবাচকতারই ইঙ্গিতবাহী। এই ইঙ্গিতময়তা বাক্যটিকে প্রতীকের মর্যাদা দিয়েছে। এছাড়া 'বন্দী বিহঙ্গ' গল্পেও মেলে এমনই বাকচাতুর্য ও ইঙ্গিতময় বাক্যের

ব্যবহার। এডিটরের স্ত্রীর চিঠির ভাষায় লেখক বাক-চাতুর্যের ব্যবহার করেছেন। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে এডিটর আবু মিয়ার স্ত্রী স্বামীর প্রতি তির্যক বাক্যবাণ ছুঁড়েছেন, যার ভেতর লুকিয়ে ছিল দাম্পত্যসম্পর্কের সূক্ষ্ম পরিহাস ও কৌশল :

> কলকাতায় তুমি এডিটরি করছো — সত্যের অনুরোধে শুধু ভাবিসাবদেরই নয়, এ পাড়া ও পাড়ায় ছোটবড়ো বউগিন্নিদেরও একথাটা বলতে হয়েছে। আমার কথা এরা সবাই শুনেছে, শুনতে একটুও উসখুস করেনি — খালি বিশ্বাস করেনি এই যা! (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ১৭)

উপর্যুক্ত স্তবকে আবু মিয়ার স্ত্রীর এই বাক্যবাণ গল্পে পরিহাসের আড়ালে বেদনার ব্যঞ্জনা বহন করছে। অন্যদিকে, আবু মিয়ার প্রতিদিনকার মনোটোনাস জীবনের একঘেয়েমি, তার অবচেতন মনের হাহাকার, গ্রাম ও পরিজনের কাছে ফিরে যাবার অব্যক্ত আকুতি চমৎকার বাকচাতুর্যে ব্যঞ্জিত :

> স্টালিনগ্রাডে নাৎসি সৈন্যের অভিযান ... আগে থেকে ধারণা করা একঘেয়ে খবর। অচেতন মনকে ছেড়ে দিয়ে কেবল হাতে পাওয়া মনটুকু নিয়েও খসখস করে কলম চালানো যায় এ লেখা লিখতে। লেখা খারাপ হয়, লাইন বেঁকে যায়, মাঝে মাঝে শব্দ ছাড় পড়ে। ... কম্পোজিটররা, খারাপ লেখা বোঝার পোকা। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখা কাগজগুলো ডাস্টবিনে ঢোকে বলে লাইন বাঁকা হওয়ার অসম্মান থাকে না। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ১৭)

এই 'হাতে পাওয়া মন'ই আবু মিয়ার একঘেয়ে জীবনের প্রতিনিধি। অচেতন মন তার পরিজনদের কাছে পড়ে থাকে বহুদূরের গ্রামে; আর কলকাতা শহরে এই ছাপোষা কম্পোজিটরের সত্তায় নিছক 'হাতে পাওয়া মন'টিই থেকে যায়। যে মনের নিষ্প্রাণতা তার আঁকাবাঁকা, মাঝে মাঝে ছাড় পাওয়া শব্দের লাইনগুলোতে প্রকাশ পায়। ভাষার চমৎকারিত্বে ব্যক্তির যন্ত্রণাকাতর অনুভূতি মূর্ত হয়ে উঠেছে এখানে।

স্ত্রীর প্রতি গুরুদয়ালের তুচ্ছতাবোধ মূর্ত হয়ে উঠেছে 'কান্না' গল্পে। আকাঙ্ক্ষিত প্রণয়িনী আহ্লাদীর সঙ্গে স্ত্রীর সৌন্দর্যের তুলনার পর স্ত্রীর অসহায় নত মুখচ্ছবি গুরুদয়ালকে প্রগাঢ়ভাবে মানবীয় করে তুললেও স্ত্রীর প্রতি তার তুচ্ছার্থবোধক মনোভঙ্গিই প্রকট হয়ে ওঠে :

> তুলনা করিল একখানা কলমুখর অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত মুখ, আর একখানা নির্বাক শ্রীহীন বেদনাময় মলিন মুখ। অন্য সময় হইলে সে অনায়াসে বউটিকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু আজ তাহার কি যেন হইল, সে দুঃখদগ্ধ রূপহীন মুখখানার দিকে চাহিয়া কেবল ভাবিতেই লাগিল। ভাবিল, এটা বড় অসহায়। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ১৪)

স্ত্রীর প্রতি 'এটা' সম্বোধন এখানে পুরোপুরি তুচ্ছার্থবোধক। একটি শব্দ দিয়েই লেখক গুরুদয়ালের ভালবাসাহীন দাম্পত্য জীবন সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন। এছাড়া 'স্পর্শদোষ' গল্পেও নামগোত্রহীন দুই ভিন্ন প্রাণের, যাদের একজন প্রান্তিক ব্রাত্য মানুষ ভজা এবং অন্যটি পথের নেড়ী কুকুর খেঁকীর তুচ্ছ জীবনবোধ ভাষারূপ পেয়েছে। পুরো গল্পজুড়ে দুই প্রাণীর খাদ্যকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই বিশ্বযুদ্ধের দূরাগত প্রভাবে সমকালীন জীবনের বিপর্যস্ত অবস্থা প্রকট হয়ে উঠেছে। "স্পর্শদোষ' গল্পে পথের নিঃসম্বল বালক ভজা ও প্রভুহীন ক্ষুধার্ত কুকুর খেঁকীর অতি তুচ্ছ জীবনযাপন এবং তাদের জীবনধর্মের সাদৃশ্যের মধ্য দিয়ে

অদ্বৈত কশাঘাত করেছেন বৈষম্য-কন্টকিত প্রচলিত সমাজ কাঠামোকে। ... খেঁকির মৃত্যুর পর তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে 'প্রিয় বিচ্ছেদ' বেদনা অনুভব করার ঘটনা উঁচু তারে বাঁধা' (বোস, ২০০৯ : ৩৯)। গল্পের এই থিম বাস্তবঘন বর্ণনায় এবং প্রতীকী পরিচর্যায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্লেষাত্মক বাক্য। ভজা ও খেঁকির পারস্পরিক সংঘর্ষ এবং সংঘর্ষের পর দুজনের আলাদাপথে নিষ্ক্রমণের চিত্র লেখক ব্যাখ্যা করেছেন শ্লেষাত্মক বাক্যে : 'তাহাদের দ্বিতীয় মিলন এইরূপ বিয়োগান্ত' মাত্র। বাক্যটি পড়ে মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে এটি কোনো প্রেমিক যুগলের বিয়োগান্তক ঘটনা। দুটো প্রান্তিক প্রাণীর পারস্পরিক সংঘর্ষ আপাত রোমান্টিক বাক্যের মোড়কে হয়ে উঠেছে চরমভাবে শ্লেষাত্মক। এ ধরনের নির্মল শ্লেষের ব্যবহার অদ্বৈত-র ভাষায় প্রায়ই ব্যবহৃত হয়েছে।

'স্পর্শদোষ' গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল কালের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বাস্তবঘনিষ্ঠ ভাষায় রূপায়িত। তবে চরিত্রের পারস্পরিক সংলাপে নয়, লেখকের বর্ণনাতেই গল্পে দূরাগত যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। যুদ্ধের অভিঘাতে জনজীবনের বিপর্যস্ত অবস্থার বর্ণনা কখনো গীতল ভাষায় প্রতিভাসিত। এই বিপর্যস্ততা ও গীতলতার বৈপরীত্য ভাষায় নতুন অভিঘাত সৃষ্টি করেছে :

> যুদ্ধহেতু দ্রব্যমূল্য অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। ... দীপ্ত দুপুরে দমকা বাতাস যেন কোন সুদূর দেশের আকুলতা জানাইয়া দিয়া যায়। হিটলার হল্যান্ড ও বেলজিয়াম আয়ত্তে আনিয়া প্যারিস আক্রমণ করিয়াছে — মিত্রপক্ষের জয় ঘোষণারত খবরের কাগজগুলিতে পাবলিক আর মৈত্রীর সন্ধান খুঁজে না। এক পয়সায় টেলিগ্রাফের উৎপাত কতকটা কমিয়া আসিয়াছে। জনমনের নিভৃত কন্দরে অনুক্ষণ অনুরণন দিয়া যায় যদি বোমা ফাটে! নিবিড় শরীরে সর্পস্পর্শের মতই কানের ভিতর দিয়া হাড়ে একটি করাল শিহরণ জাগায় — তাহা হইলে না জানি কেমন হয়। তাহা ছাড়াও আছে অদূর ভবিষ্যতের উদর চালানোর চিন্তা। রাস্তায় আর কাগজের কুচি পাওয়ার উপায় নাই। এক টুকরা কাগজ দেখিলে তিনজনে কুড়াইবার জন্য হাত বাড়ায়। ভজার সমব্যবসায়ীদের অনেকেরই ভাত উঠিয়াছে। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ২২)

সামাজিক বৈষম্য এখানে ভাষার কারুকর্মে স্পষ্ট। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে এ গল্পে মানুষ ও কুকুরের জীবন একীভূত হয়ে গেছে। লেখকের ভাষায় :

> বুভুক্ষু সংসারের পরিতৃপ্তি বলিয়া কিছু নাই। দোকানের মাইনে করা বালক মালিকের চক্ষু বাঁচাইয়া একখানা জিলিপী মুখে পুরবার জন্য একটি কেরোসিন কাঠের বাক্সের আড়ালে মাথা গলাইল।
>
> নোংরা সিঁড়ির ধাপে পা বাড়াইয়া খেঁকী হরিজনের মত ব্যাকুল চোখে ভজার দিকে একবার তাকাইয়া চোখ নত করিল। হাতের কাছেই একখানা তক্তার উপর মোটামোটা একতাল রুটি। অন্যমনস্কতার ভাব ও কনুই- এর ধাক্কা-রুটির কাঁড়ি ড্রেনে গড়াইবার পূর্বেই সন্ধানী খেঁকী মুখ বাড়াইয়া তালশুদ্ধ রুটি লইয়া নিরাপদ স্থানের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিল। কয়েকটি মিষ্ট সম্ভাষণের অধিক কিছু ভজার ভাগ্যে ঘটিল না। অবিলম্বে সে খেঁকীর অনুসরণ করিয়া চলিল। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ২৩)

তিনটি প্রাণী এখানে 'ক্ষুধা' নামক শব্দ দ্বারা অস্তিত্ব চেতনায় পরস্পর একীভূত। এরা হল দোকানের কর্মচারী, খেঁকী ও ভজা। দোকানের কর্মচারীর জিলিপী চুরির দৃশ্যে 'মাথা

গলাইল' — এই দুই শব্দ দ্বারা লেখক খেঁকী ও বালক কর্মচারীকে একাত্ম করে তুলেছেন। এ ভাষা পুরোপুরি চিত্রল।

বাক্যবিন্যাসে নাটকীয় চমক সৃজন অদ্বৈত-র গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'বন্দী বিহঙ্গ' গল্পে জমিলার দ্বিতীয় চিঠির প্রথম বাক্য আবু মিয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠককেও বিস্মিত করে তোলে। 'পাখিটা মুক্তি পেয়ে গেল' — এ ধরনের নাটকীয় বাক্য পাখি প্রতীকে আবুর সন্তানদের চিহ্নিত করায় পাঠক মনে প্রশ্ন জাগে, তবে কী হারিয়ে যাওয়া দুর্ভাগা সন্তানদের মতো আবু মিয়ার সন্তানেরাও হারিয়ে গেল জমিলার স্নেহরূপ কারাগার ছেড়ে? যদিও গল্পশেষে সকল টেনশনের অবমুক্তি ঘটান লেখক। আসলে ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যঞ্জনাময় অনুভববেদ্য গদ্যসৃষ্টি অদ্বৈত-র গল্পের ভাষাশৈলীর অন্যতম দিক। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজও মনে করেন, ছোটগল্পে অদ্বৈত-র ভাষা প্রকৃতপক্ষেই ইঙ্গিতপূর্ণ, দক্ষ-শিল্পীর মতোই তিনি চরিত্রের সার নিষ্কাশিত করেছেন বিচিত্র সর্পিল ঘটনাসংস্থান ও প্রগাঢ় বৈপরীত্যের সৃজনে। এরকম কয়েকটি উদাহরণ :

ক. এই বিপুল জনারণ্যে কাহারও মাথা ভাঙ্গিলে জানিবার লোকের অভাব হয় না — কিন্তু কাহারও বুক ভাঙ্গিলে, সে খোঁজ কেহই রাখেনা। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ২৩)
খ. খেঁকীর দিনরাত্রির শান্তি যেন ভজা চুষিয়া খাইয়াছে। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ২৩)
গ. মনের দিক দিয়া শুখাইতে শুখাইতে যাহার দেহ কাঠ হইয়া যায় — অনাহারের দোষই তাহার প্রতি আরোপিত হয়। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ২৩)

উপর্যুক্ত উদাহরণগুলোর অন্তর্গত ব্যঞ্জনা পাঠক অনুভব করতে পারেন। প্রথম উক্তিতে দরিদ্র কম্পোজিটরের যান্ত্রিক জীবন-সম্পর্কিত নেতিবাচক মনোভঙ্গি প্রকাশিত। কলকাতা শহরের বদ্ধ যান্ত্রিকতায় মানসিক সুখের অবকাশহীনতাই উপর্যুক্ত বাক্যের মৌল অভিব্যক্তি। দ্বিতীয় উক্তিতে খেঁকী ও ভজার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব রূপায়ণে লেখক 'চুষিয়া' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে একে নেতিবাচক করে তুলেছেন। সর্বশেষ বাক্যেও স্বস্তিহীন মনের ওপরেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে প্রগাঢ়ভাবে। শব্দ ব্যবহারের চমৎকারিত্বেই চরিত্রের মানসভূমিকে অনুভববেদ্য করে তুলতে পেরেছেন লেখক। এভাবেই 'সন্তানিকা' গল্পের বৃদ্ধ মাস্টারের শারীরিক বিকলতার অনুভব পাঠক চেতনায় সঞ্চারিত হয়ে যায় শব্দদ্বৈতের ব্যবহারে :

> আজকাল মাস্টারের আহার কমিয়া আসিয়াছে। ... আবার রাত্রিতে জ্বর হয়, ঘুষঘুষে জ্বর, হাড়ে হাড়ে, শিরায় শিরায় এই জ্বর ক্রিয়া করে। কাঁপুনি ধরে না তবু এ যেন অসহ্য জ্বর ... তারপর শরীরের ভিতরস্থ একটা নির্দিষ্ট স্থান হইতে নিমৃনিমে বেদনার মত একটা কিছু বাহির হইয়া ক্রমে সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ৭)

এখানে ঘুষঘুষে, হাড়ে হাড়ে, শিরায় শিরায় কিংবা নিমৃনিমে শব্দদ্বৈত ব্যবহার করে লেখক বৃদ্ধ শিক্ষকের স্বস্তিহীন শারীরিক ও মানসিক অবস্থাকে মূর্ত করে তুলেছেন।

অনুভববেদ্য ভাষা শুধু উপর্যুক্ত বর্ণনাতেই ধরা পড়ে না, 'বন্দী বিহঙ্গ' গল্পে লেখক কৌশলে আবু মিয়ার স্ত্রী জমিলার চিঠির আবেগ ও আবু মিয়ার মনের সংবেদনশীলতাকে একাকার করে তোলেন। এর প্রগাঢ় সংবেদনশীল ভাষা পাঠক চেতনাকে দ্রবীভূত করে। চিঠি ও আবু মিয়ার মনঃসংলাপের কোথাও লেখক কোনো বিরতি এঁকে দেননি। মনে হয়, পারস্পরিক কথোপকথনরত আবু মিয়া ও তার স্ত্রী যেন এখানে মুখোমুখি। চিঠির শেষাংশে আবু মিয়া যখন

মন্তব্য করেন, 'কি বেড়ে হয়েছে চিঠির এইখানটা' তখন বোঝা যায়, এরা মুখোমুখি বসে নেই। বরং এদের দুজনের ভেতর স্থানিক ও কালিক দূরত্ব রয়েছে। উদাহরণ :

> ... তুমি সাংবাদিক। তুমি সারা দুনিয়ার খবর রাখ, শুধু একটা মানুষের মনের খবর রাখার বেলাতেই বুঝি তোমার ভুল হয়।
> বড্ড হাসির কথা। ভারি ছেলেমানুষ জমিলা। কলকাতায় একা থাকি। কে দেখে কে শোনে। নিকটে এসে থাকতে চায়। আমার উপর তার মমতাটুকু পাছে ব্যক্ত হয়ে পড়ে তাই কথাটা অন্যভাবে বলেছে। ... খোকা দুটি মূর্খ হয়ে রইল, মেয়েটা আহম্মকের একশেষ ... কি দুষ্ট গো তোমার ছেলেদুটি। আর শোনো সেদিন হয়েছে কি ... (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ১৭)

দাম্পত্য সম্পর্কের উষ্ণ আবেগ এবং সেই সঙ্গে জমিলার নৈঃসঙ্গ্যবোধ এ গল্পের ভাষায় একাকার হয়ে আছে, যা পাঠকচেতনায় খুব সহজেই সঞ্চারিত হয়ে যায়।

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মণ যে ঐতিহ্যিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, গল্পগুলোতে তেমন গভীরভাবে সেই অনুষঙ্গ না মিললেও প্রবাদ-প্রবচন এবং লোকগানের ব্যবহার 'কান্না' গল্পকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। এ গল্পের শুরুতেই বৈষ্ণব গানের অনুরণন অনুভব করা যায়। এছাড়া অন্তঃপুরচারী নারীদের পরিমণ্ডল সৃজনে গল্পভাষায় মুখে মুখে উচ্চারিত প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারে লেখকের দক্ষতা অনুভূত হবে :

ক. এক নাক — ঝাড়ায় উঠাতো আর এক মুখ নাড়ায় বসাতো। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ১০-১১)
খ. দুর্বাঘাসে বাঘ গজানো বরঞ্চ সম্ভব। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ১১)
গ. ঠ্যাং হাত ধুয়ে দেই তোর কপালে। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ১৪)
ঘ. ঢাল নেই তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ১৪)

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে 'জনজীবনকে আত্মস্থ করে নেয়ার জন্যে ... অদ্বৈত সাধারণভাবে প্রচলিত শব্দগুচ্ছ ইডিয়ম ও বাকরীতিকে গ্রহণ ও অনুসরণ করেছেন। তাই সংলাপে ত বটেই ঔপন্যাসিকের নিজের বর্ণনায়ও তিনি লোকজ শব্দ ব্যবহার করেছেন' (কায়সার, ১৯৮৭ : ২০)। তিতাস নদীকেন্দ্রিক যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এ উপন্যাসে বিধৃত, তাকে আরো সার্থক করে তুলতে গিয়েই আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন অদ্বৈত। কিন্তু তাঁর গল্পের ভাষায় আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার তেমন নেই। শুধু 'কান্না' গল্পেই কিছু প্রবাদ প্রবচনের দেখা মেলে; অন্য গল্পগুলো পুরোপুরি নির্দিষ্ট স্থান ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলেই হয়তো Local colorএর প্রতিচ্ছায়া তেমন প্রগাঢ় হয়ে ওঠেনি। যদিও চারটি গল্পেই আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছেন অদ্বৈত। উদাহরণ :

ক. লোকজ শব্দ : নোয়াইয়া, আবাগী, ঠেঙ্গায়, ঠ্যাং,
সক্‌ড়ি, বুড়া, উস্কু-খুস্কু, বালাই, মিছামিছি, খিচাইয়া, পিট্টি।
খ. লোকজ উচ্চারণে মূল শব্দের বর্ণ বিপর্যয় :
গিয়ান, ছিরিক্ষেত্র, বিন্দেবন ।

অদ্বৈত-র গল্পভাষায় এসব লোকায়ত শব্দ বাস্তবতা সৃজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিবৃতি ও সংলাপ — উভয়ক্ষেত্রেই এই ধরনের শব্দ ব্যবহার লক্ষণীয়। বিশেষ করে, শ্রেণিচরিত্রের বস্তুনিষ্ঠ রূপ অঙ্কনে এই শব্দব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা পাঠক উপলব্ধি

করেন। তবু তাঁর ছোটগল্পের ভাষায় আঞ্চলিক স্বরভঙ্গির গাঢ় উচ্চারণ প্রবল নয়। আঞ্চলিক উপন্যাসগুলোতে 'একটি মাত্র সংলাপে চরিত্র নোনাগন্ধ' (হক, ১৯৮১ : ১০৫) নিয়ে নিজের অঞ্চলকে যেমনভাবে উপস্থাপন করে, অদ্বৈত মল্লবর্মণের ছোটগল্পে আঞ্চলিকতার সেই নোনা গন্ধ, যাকে বলা যেতে পারে 'Local color', তার অস্তিত্ব তেমন গভীরভাবে অনুভূত হয় না।

রাবীন্দ্রিক গীতলতার প্রভাব অদ্বৈত মল্লবর্মণের গল্পভাষার আরেক প্রান্ত – যা তাঁর ভাষাকে করে তুলেছে কবিতাক্রান্ত। তবে শুধু রাবীন্দ্রিক ভাষাই নয়, তাঁর গদ্যভাষায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষাবৈশিষ্ট্যেরও প্রভাব লক্ষ করেছেন সুমিতা চক্রবর্তী। উপযুক্ত উদাহরণ সহকারে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাবে। প্রথমেই তাঁর ভাষায় রাবীন্দ্রিক গীতলতার প্রভাব বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

'সন্তানিকা' গল্পে বৃদ্ধের মনে একাকী মৃত্যুকে আলিঙ্গনের ভীতিবোধ তার অস্তিত্বহীনতাকেই বড় করে তুলেছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'জাহাজী' গল্পের বৃদ্ধ জাহাজীর ভেতরও এই নিরস্তিত্বের যন্ত্রণা রয়েছে। গল্পশেষে তাই নিঃসঙ্গ মৃত্যুর আসন্ন যন্ত্রণাকে 'বড় ভয় লাগে তার, একাকী সে মরিবে কেমন করিয়া! যতদূর দৃষ্টি যায় — চাহিয়া দেখে এই বিপুল বিরাট আকাশ, এই বিশাল পৃথিবী, তাহার জন্য একটুও স্থান নেই।' বিশাল পৃথিবীর পটে বৃদ্ধ ধনঞ্জয়ের এই তুচ্ছতাবোধ পাঠকচেতনায় সঞ্চারিত হয়ে যায়। এই অস্তিত্বহীনতার যন্ত্রণা তাকে বীরেশবাবুর বাড়িতে ফিরিয়ে আনে। বিস্ময়করভাবে মনিবগিন্নির ভেতরেও রূপান্তর ঘটে। বৃদ্ধ যখন তার সমস্ত স্নেহ-বুভুক্ষু অন্তঃকরণ নিয়ে গিন্নিমার সামনে উপস্থিত হয় তখন 'গিন্নীমা থমকিয়া দাঁড়ায় — এই ব্যথাক্লিষ্ট সর্বহারাটির দিকে চাহিয়া বুকের দরদ যেন উথলিয়া উঠে, এ যেন বিশ্বের স্নেহ বুভুক্ষিত সন্তান মাতৃহৃদয়ের দ্বারদেশে মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে! গিন্নীমার মুখখানাও বেদনা ও করুণায় এমন আকার ধারণ করিয়াছে — যেন বিশ্বের চিরন্তন মাতৃমূর্তি অজস্র স্নেহ বক্ষে লইয়া তৃষিত সন্তানকে অভয় দিতেছে।' এই বাক্যগুলোতে রাবীন্দ্রিক ভাষার প্রভাব মেলে। এছাড়া বৃদ্ধ ধনঞ্জয়ের ঐকান্তিক বাস্তবতা যেখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে সেখানেও মেলে রাবীন্দ্রিক ভাষার প্রতিচ্ছায়া :

> একে সে বুড়া — থুরথুরে বুড়া হইয়া গিয়াছে, হালশূন্য জীবনের তরণীটা যদি বা ভাসিতে ভাসিতে আশাতীতের মত এখানে আসিয়া ঠেকিয়াছে, একটা কিনারা সে পাইয়াছে, এই কূল হইতে তাহার ডুবো-ডুবো তরীটাকে ভাসাইয়া দিলে সে আর কূল পাইবে কি না কে বলিবে। হয়তো একটা বিপাকে, একটা ঘূর্ণিপাকে টুপ করিয়া ডুবিয়া যাইবে, কেহ দেখিবে না, কেহ জানিবে না। ভবের মহাসমুদ্র কল্লোল হইতে উত্থিত একটা ক্ষুদ্র বুদ্বুদ চক্ষুর নিমেষে মিলাইয়া যাইবে! ... (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ৭)

উপর্যুক্ত উক্তির শুরুর অংশটিতে রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পের নদীরূপ জীবনপ্রবাহের এবং শেষ অংশে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের বর্ষার পদ্মার প্রবল স্রোতে খোকার ডুবে যাবার দৃশ্যকল্পের ছায়াপাত লক্ষণীয়। পদ্মার নিস্পৃহতা যেন অদ্বৈত-র এই বর্ণনাতে জীবনরূপ-নদীর নিস্পৃহ প্রবহমানতায় আরোপিত। 'হালশূন্য তরণী', 'ডুবো-ডুবো তরী'

— এই শব্দগুলো নিরস্তিত্বের যন্ত্রণাকাতর এক বৃদ্ধের অন্তিম জীবনভাবনাকেই প্রতীকায়িত করে তুলেছে।

শুধু 'সন্তানিকা' গল্পেই নয়, 'বন্দী বিহঙ্গ' গল্পে কলকাতার যান্ত্রিক জীবনে বন্দী এক বিহঙ্গের মতো আবু মিয়া মুক্ত প্রকৃতি আর পরিজনের সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। তার এই ব্যাকুলতা গীতল ভাষায় বর্ণিত। বাক্য-বিন্যাস, শব্দ চয়ন এবং অলংকার ব্যবহারে লেখক অনেকটা রাবীন্দ্রিক গীতলতাকেই ধারণ করেছেন। কলকাতার রুদ্র গ্রীষ্মের বাউল বাতাস যখন বয়ে যায়, যখন আকাশে মেঘ জমে, তখন আবু মিয়ার মনের কোণেও মেঘের আনাগোনা লক্ষ করা যায়। প্রিয়জনবিহনে যে কথাগুলো মনের আনাচেকানাচে অংশে এলোমেলো পায়ে হেঁটে বেড়ায়, সে কথাগুলোও পুরোমাত্রায় কাব্যিক। মেঘ ও ঝড়ো হাওয়ার বর্ণনানুষঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বালক' কবিতার ভাষা মনে পড়ে। 'বালক' কবিতার কয়েকটি পঙ্ক্তি এরকম :

> ইমারত-ঘেরা ক্লিষ্ট যে আকাশটুকু
> তাকিয়ে থাকত একদৃষ্টে আমার মুখে
> বাদলের দিনে গুরু গুরু করে তার বুক উঠল দুলে।
> বটগাছের মাথা পেরিয়ে কেশর ফুলিয়ে দলে দলে
> মেঘ জুটত ডানাওয়ালা কালো সিংহের মতো। (ঠাকুর, ১৪০৯ : ২৬৬)

অদ্বৈত-র 'বন্দী বিহঙ্গের' কয়েকটি লাইন এ বর্ণনার প্রায় কাছাকাছি :

> ... বড় বড় দুতলা তিনতলা বাড়িগুলোর উপর দিয়ে যে আকাশটুকু দেখা যায়, তাতে যখন মেঘ করে আসে, আর আসে একটা হাল্কা হাওয়া, তখন আবু মিয়ার বিশেষ করে মনে পড়ে একটি মানুষের কথা। তাদের আকাশ কত বড়ো, তাতে যখন ঈশান কোণ আঁধার করে মেঘ জমে, পুকুরের জলে নেমে আসে তার কালো ছায়া, অতটুকু ছোট পুকুরের বুকে এতবড় কালো ছায়া ধরে না বুঝি হায়, সে কি তখন খড়ো-ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় না, তারো কি মনে এমন একটি বড় ছায়া ধরি ধরি করেও উপচে ওঠে না — সে কি অনেক কথা — অনেক দিনের রাতের টুকরো টুকরো অনেক কথা — ভাবে না! (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ১৬)

টুকরো ছবির কোলাজ এবং উপমা ও চিত্রকল্প ব্যবহারের ফলে এ বাক্যগুলো গীতল হয়ে উঠেছে। চিত্ররূপময় এই বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের 'বালক' কবিতার বন্দি বালক ও শহুরে যান্ত্রিকতার জঞ্জালে বন্দি আবু মিয়ার মুক্তির আকুতি এখানে একাকার হয়ে গেছে। আবু-র স্ত্রীর চিঠির ভাষাও চিত্ররূপময় :

> পুকুর পাড়ে আলো-ছায়ার খেলা
> উঠোনে পড়ন্ত রোদের যাই যাই ভাব, বন-বাদাড়ে পাখপাখালির কলবর, এসব তো আবু মিয়া জমিলার চোখ দিয়েই অনেকদিন ধরে দেখে আসছে। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ১৭)

'জমিলার চোখ' এখানে চিঠির ভাষা; সেটি পুরোপুরি চিত্ররূপময়। এ ভাষায় আলো ছায়ার খেলায় ইম্প্রেশনিস্টিক বর্ণনার প্রভাব লক্ষণীয়। গত হয়ে যাওয়া দুপুর আর আসন্ন বিকেলের চমৎকার মিশেল গল্পের ভাষায় যেন নরম রঙের পরশ বুলিয়ে দেয়।

এসব বৈশিষ্ট্য ছাড়াও অদ্বৈত-র 'ভাষারীতি ও বর্ণনা ভঙ্গীতে নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য ও চকিত গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে' (বিশ্বাস, ১৯৯৮ : ৭৮)। বর্ণনারীতির নির্লিপ্ত-নিস্পৃহ ভঙ্গিই ভাষার ক্ষেত্রে তাঁকে মানিকের গোত্রভুক্ত করে তোলে। এ কারণেই 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরানার ভাষাশিল্পী ছিলেন তা ... নিশ্চিতভাবেই বলা যায়' (চক্রবর্তী, ১৯৯৫ : ৯৪)। মানিক তাঁর ছোটগল্পে বা উপন্যাসে, বিশেষ করে *পদ্মা নদীর মাঝি* উপন্যাসে যে অপ্রতিরোধ্য জীবনপ্রবাহের কথা লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের মতো তা মানবজীবনের প্রসন্ন অফুরান রসের কথা বলে না। একটি কুটিল ক্রূর নিষ্ঠুর সংগ্রামের কথা যেন মানিকের ভাষার শরীরে লেপটে থাকে। জীবনের অতলে আছে যে প্রচণ্ড আসক্তি, বিনাশ আর আক্রোশের দ্বন্দ্ব মানিকের ভাষা ঠিক তাকেই প্রকাশ করে দেয়' (হক, ২০১৪ : ৯৭)। মানিকের মতোই অদ্বৈত এমন এক শিল্পী, যাঁর ভাষাভঙ্গিতে জীবনের অপ্রতিরোধ্য গতির সঙ্গে নিষ্ঠুর সংগ্রাম যুক্ত হয়ে যায় নিস্পৃহভাবে। 'সন্তানিকা' গল্পে বৃদ্ধের জীবনসংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে তার গভীর চিন্তনস্রোত। বৃদ্ধের চিন্তনস্রোতে তার অস্তিত্বসংগ্রাম ও জীবন-ভাবনা প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে :

> এক একবার তাহার মনে হয়, বীরেশবাবু সর্বশক্তিমান্ — সৃষ্টিকর্তার নাড়ির সঙ্গে তাঁহার নাড়ির কোথায় যেন একটা অচ্ছেদ্য যোগসূত্র রহিয়াছে– সেইটা দুনিয়ার আর যেন কোন মানুষের সঙ্গে নাই। তিনি ইচ্ছা করিলেই ধনঞ্জয়ের অদূরাগত মৃত্যুটার উপরেও হেন কারিকুরি করিতে পারেন। ... কিন্তু ওই অটল শক্তিধর মুখখানার দিকে তাকাইলে সে ভরসা মোটেই থাকে না। বিধাতা কি কঠোর করিয়াই না ঐ মুখখানা সৃষ্টি করিয়াছেন! বিশ্বের অর্ধেক কঠোরতা ওই মুখে ঢালিয়া দিয়াছেন। আর তাহা না হইবেই বা কেন? স্রষ্টার প্রতিনিধি ত তিনি! সৃষ্টিকর্তার মুখই বা কোন কোমলতায় গড়া ... (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ৭)

চমৎকার তির্যক বাক্য ব্যবহার করে অদ্বৈত এই বৃদ্ধের সৃষ্টিকর্তাবিষয়ক ভাবনাকে ভাষারূপ দিয়েছেন। মানিক লিখেছেন : 'ঈশ্বর থাকেন ঐ ভদ্র পল্লীতে' — একই ভাবনায় অদ্বৈত-র এই বৃদ্ধ মাস্টারও যেন তাড়িত। ঈশ্বর যে ধনিক শ্রেণির প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট, ধনঞ্জয়ের উক্তিতে সে কথাটি আর গল্পের আড়ালে থাকে না। ধনিক শ্রেণির প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট কঠোর সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে বীরেশবাবুর অটল শক্তিধর মুখের শীতল কঠোরতা এখানে সমীকৃত।

শুধু ঈশ্বর ভাবনাতেই নয়, খেঁকীর মৃত্যুমুহূর্তকে বাস্তবঘন নির্মোহ বর্ণনায় চিত্রল করে তোলার ক্ষেত্রেও অদ্বৈত-র নির্লিপ্ততা ও নিস্পৃহতা মানিককেই স্মরণ করিয়ে দেয় :

> বীরবরদের লাঠির আঘাতে কুকুরটির মাথা ফাটিয়া গিয়াছে, জমাট রক্ত তখনও লাগিয়া রহিয়াছে। জিহ্বাটা অনেকখানি বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। একখানি লোহার শলার খানিকটা একটা চক্ষুকে ফুঁড়িয়া দিয়াছে। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ২৪)

এই বর্ণনায় আবেগহীন নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিই লালন করেছেন অদ্বৈত।

গল্পের ভাষায় অলংকার ব্যবহারে অদ্বৈত চমৎকারিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প প্রতীকের মিথস্ক্রিয়ায় অদ্বৈত-র গল্পভাষা সুগঠিত। অলংকার প্রয়োগের কয়েকটি উদাহরণ :

উপমা

ক. শরীরের ভিতরস্থ একটা নির্দিষ্ট স্থান হইতে নিম্নিমে বেদনার মত একটা কিছু বাহির হইয়া ক্রমে সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ৭)
খ. শায়ক-বিদ্ধ পাখীর মতই ধনঞ্জয় ছটফট করিতে করিতে ধাইয়া আসে। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ৮)
গ. আবু মিয়ার মন বলে যে জিনিসটা আছে, সেটা আফিমের মত তেতো আর আছন্ন হয়ে যায়। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ১৯)
ঘ. স্বল্পজীবী সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে চলা আবু মিয়ার মনে হয় রেস-খেলার মতো ক্লান্তিকর। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ১৬)
ঙ. পকেটের চিঠিখানা এক কাপ গরম চায়ের মতো কাজ করে। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ১৯)
চ. নোংরা সিঁড়ির ধাপে পা বাড়াইয়া খেঁকী হরিজনের মত ব্যাকুল চোখে ভজার দিকে একবার তাকাইয়া চোখ নত করিল। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ২২)
ছ. নিবিড় শীতের সর্পস্পর্শের মতই কানের ভিতর দিয়া হাড়ে একটি করাল শিহরণ জাগায়। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ২২)

উপর্যুক্ত উপমায় কাব্যিক ভাষার পরিবর্তে নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গির তির্যক বর্ণনা মুখ্য করে তোলার মধ্যেই অদ্বৈত-র ভাষা অভিনবত্ব পেয়েছে।

উৎপ্রেক্ষা

হাঁটু পর্যন্ত পরতে পরতে ধুলা লাগিয়াছে — যেন মোজা পরিয়াছে। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ৩)

সমাসোক্তি

এখন মৃত্যুকে ভয় করে না সত্য। কিন্তু যখন প্রকৃতই মৃত্যু আসিয়া তাহার তুহিন শীতল হস্তদ্বয় স্পর্শ করাইবে — তখন যে বড় ভয়। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ৫)

চিত্রকল্প

সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ। পার্কস্ট্রিট যেখানে সার্কুলার রোডে মিলিয়াছে তাহারই নিকটে একটি জনবিরল স্থানে গাছের ছায়াটি দূরাগত আলোর অত্যাচারে আবছা ফ্যাকাশে হইয়া উঠিয়াছে। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ২১)

প্রতীক

হালশূন্য জীবনের তরণীটা যদি ভাসিতে ভাসিতে আশাতীতের মত এখানে আসিয়া ঠেকিয়াছে একটা কিনারা সে পাইয়াছে, এই কূল হইতে তাহার ডুবো ডুবো তরীটাকে ভাসাইয়া দিলে সে আর কূল পাইবে কিনা কে বলতে পারে। (মল্লবর্মণ, ২০০০ : ৭)

রূপক

ক. কৃচ্ছ্রতার ছিটানো কালির তিলক
খ. দারিদ্র্যের কুয়াশা
গ. শীতের সর্পস্পর্শ

অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর গল্পের প্রতিবেশ পরিপ্রেক্ষিত, চরিত্রায়ণ এবং কাহিনি নির্মাণে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা মননসমৃদ্ধ। ব্যক্তিমানুষের 'ভাষাজ্ঞান ও ভাষা ব্যবহার কখনও একটি মাত্র উপভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। নানা জনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, কিংবা নানা উপলক্ষে, সে একই ভাষার বিভিন্ন উপভাষা বা ভঙ্গি ব্যবহার করে, ... ফলে নানা

ভাষাভঙ্গিমা ও ভাষাবৈচিত্র্য মিলিয়ে সে একটি প্রশস্ত ভাষা ভাণ্ডার বা Linguistic Repartoire গড়ে তোলে' (সরকার, ১৪০৫ : ১৪৮)। অদ্বৈত-র গল্প ভাষায়ও পাঠক এমন এক প্রশস্ত ভাষা ভাণ্ডারের আয়োজন লক্ষ করেন। ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক সুষমাজাত গীতল ও বাস্তবঘন ভাষার মিথস্ক্রিয়ায় অদ্বৈত-র গল্প ভাষা নির্মিত। এ ভাষা তাঁর উপন্যাসের ভাষাভঙ্গিমা থেকে অনেকটাই পৃথক। কেননা 'কোনো লেখকের 'ভাষা শৈলী' এক ও অবিচ্ছিন্ন থাকে না। তিনি নানা ধরনের রচনা যদি লেখেন, সেই নানা ধরনের রচনা নানা ধরনের ভাষাশৈলী দাবি করে (সরকার, ২০১৪ : ১)। অদ্বৈতও এর বাইরে নন। তাঁর গল্পে তাই একইসঙ্গে বিচিত্র মানুষের মনোলোক ও বহির্জগতের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া উঠে আসে বিচিত্র বাক্যবিন্যাসে। আখ্যানবয়নে অদ্বৈত নিজে বর্ণনাপ্রধান—তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সংলাপ কম। বর্ণনার প্রাধান্য আর চরিত্রের নিরাসক্ত মনোসংলাপধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির মিথস্ক্রিয়ায় তাঁর গল্পের ভাষা নির্মিত। একই সঙ্গে তাঁর গল্পের ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে প্রতীক ও ইঙ্গিতময়তা, চিত্ররূপময় গীতিধর্মিতা এবং শ্লেষাত্মক তির্যক বাক্য। এভাবেই চরিত্রের মনোজগতের রূপ নির্মাণ করতে গিয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর গল্পের ভাষাকে বিশিষ্ট করে তুলেছেন।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

কবির, আহমদ ২০০১। 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয় ও প্রকরণ'। *বাংলাদেশের সাহিত্যের আলোচনা পর্যালোচনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ* [সম্পা. প্রণব চৌধুরী], জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন। ঢাকা। পৃ. ২৬৫-২৭৪

কায়সার, শান্তনু ১৯৮৭। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ*। বাংলা একাডেমী। ঢাকা।

খান, রফিকউল্লাহ ২০০৭। 'ছোটগল্প'। *ভাষা ও সাহিত্য* [সম্পা. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ] বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। ঢাকা। পৃ. ৪০৯-৪৩২

চক্রবর্তী, সুমিতা ১৯৯৫। 'ছোটগল্পের অদ্বৈত মল্লবর্মণ'। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ : একটি সাহিত্যিক প্রতিস্রোত* [সম্পা. অচিন্ত্য বিশ্বাস ও মনোহর বিশ্বাস]। চতুর্থ দুনিয়া। কলকাতা।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ১৪০৯। ('পুনশ্চ') *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। বিশ্বভারতী। কলকাতা।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য ১৯৯৮। *প্রসঙ্গ অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম*। রত্নাবলী। কলকাতা।

বোস, চঞ্চল কুমার ২০০৯। *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*। বাংলা একাডেমী। ঢাকা।

মল্লবর্মণ, অদ্বৈত ২০০০। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ রচনাসমগ্র* (অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত)। দে'জ পাবলিশিং। ঢাকা।

সরকার, পবিত্র ১৪০৫। *ভাষা দেশ কাল*। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। কলকাতা।

সরকার, পবিত্র ২০১৪। *উপন্যাসের ভাষাশিল্প*। নান্দীপাঠ। ঢাকা।

হক, হাসান আজিজুল ১৯৮১। *কথাসাহিত্যের কথকতা*। সাহিত্য প্রকাশ। ঢাকা।

Marx and Engels 1958. Collected Works (in German), Berlin. উদ্ধৃত : ভাষা দেশ কাল [পবিত্র সরকার]। পৃ. ৯। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। কলকাতা।